গ্রন্থবীক্ষণ

পুণ্যব্রতে পূর্ণযোগী স্বামী আত্মস্থানন্দ

গৌরী ভৌমিক

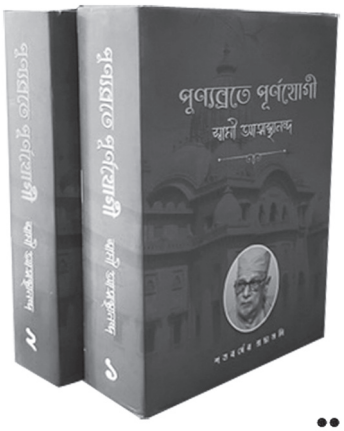

শ্রীরামকৃষ্ণদেব একদিন ভাবাবেশে বলেছিলেন, "জীবে দয়া নয়, শিবজ্ঞানে জীবের সেবা।" সেখানে উপস্থিত নরেন্দ্রনাথ একথায় তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার হদিশ পেয়ে যান নিমেষে। 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই বেদান্তবাক্য তাঁর কাছে এক অনন্য আলোকে উদ্ভাসিত হয়। এরপর দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে স্বামী বিবেকানন্দরূপে ফিরে এসে ১৮৯৭ সালে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করে তিনি ব্রত নির্ধারণ করেন, 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'। সন্ন্যাসের অন্যতম লক্ষ্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য কেবল ধ্যান-সমাধিতে মগ্ন হয়ে থাকা নয়, শিবজ্ঞানে আর্ত জীবের সেবা। এই ব্রত সাধন করতে করতে সাধক উপলব্ধি করবেন 'জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ'। এভাবে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করে ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মাই হয়ে যাবেন।

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের পঞ্চদশতম সঙ্ঘাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ ছিলেন এই পুণ্যব্রতে নিবেদিতপ্রাণ পূর্ণযোগী। জন্মসূত্রে তিনি লাভ করেছিলেন বিরল আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার। সাত ভাই ও তিন বোনের মধ্যে তিনি ছাড়া আরও তিন ভাই ও এক বোন সন্ন্যাসজীবন গ্রহণ করেছিলেন। যৌবনেই সত্যকৃষ্ণ সরাসরি আহ্বান পান স্বামীজীর কাজে জীবন উৎসর্গ করার। ছাত্রজীবনে বরিষ্ঠ সন্ন্যাসীদের পূতসান্নিধ্যলাভের সুযোগ ঘটে। বেলুড় মঠে শ্রীমন্দিরের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য তাঁর হয়। বাইশ বছর বয়সে উচ্চশিক্ষা অসমাপ্ত রেখে বেলুড় ।৩১।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যে নিষ্ণাত ও সুলেখিকা

মঠে যোগদান করেন তিনি। প্রথম কর্মক্ষেত্র দেওঘর বিদ্যাপীঠ। এরপর মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম। সেখান থেকে শ্যামলাতাল। সেখানে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজ স্বয়ং তাঁকে নিজের সেবক নির্বাচন করে নিয়ে আসেন। তাঁর কাছে ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাসদীক্ষা লাভ করে সত্যকৃষ্ণ প্রথমে ব্রহ্মচারী শান্তিচৈতন্য ও পরে স্বামী আত্মস্থানন্দ হয়ে ওঠেন। দীর্ঘদিন স্বামী বিরজানন্দজীর ব্যক্তিগত সেবকরূপে অবস্থান নিঃসন্দেহে তাঁর আধ্যাত্মিক অভ্যুদয়ের দৃঢ় ভিত্তি রচনা করেছিল। পরবর্তী কালে সঙ্ঘের বিভিন্ন কর্মবহুল পদ নিপুণ দক্ষতায় সামলাতে গিয়েও তাঁর আধ্যাত্মিক জীবন কখনও বিড়ম্বিত হয়নি। স্বামীজীর আদর্শে সেবাকাজের পাশাপাশি সুনির্দিষ্ট আধ্যাত্মিক উত্তরণের দ্বারা তাঁর জীবন গুরুশক্তির আধার হয়ে উঠেছিল সহ-সঙ্ঘাধ্যক্ষ ও সঙ্ঘাধ্যক্ষরূপে।

স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজের অনুরাগী ও অনুগামীদের মধ্যে সকলেই যে তাঁর দীক্ষিত এমন নয়। বরং তাঁর গুণমুগ্ধ শুভানুধ্যায়ীর সংখ্যা আরও অনেক বেশি। জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তিযোগের দ্বারা সুসমন্বিত এই পূর্ণযোগীর জীবনদীপ থেকে যারা নিজেদের জীবন আলোকিত করার সুযোগ পেয়েছিলেন, তাঁর জন্মশতবর্ষে তাঁরা উদ্যোগী হয়েছেন স্মরণিকা রচনার। বাংলা ভাষায় দুটি খণ্ডে এই মহান সন্ন্যাসীর বিশাল ও বর্ণময় জীবন তাঁরা তুলে ধরেছেন।

প্রথম খণ্ডের ভূমিকাস্বরূপ রয়েছে পূজনীয় মহারাজজীর মহাসমাধির পর বেলুড় মঠ থেকে প্রকাশিত মহারাজজীর জীবনী। প্রথম অধ্যায়ে রয়েছে তাঁকে নিয়ে বহু সন্ন্যাসী এবং শ্রীসারদা মঠের দুজন সন্ন্যাসিনীর স্মৃতিচারণ। পূজনীয় মহারাজের কর্মজীবনের সঙ্গী সন্ন্যাসী ছাড়াও সঙ্ঘাধ্যক্ষ, সহ-সঙ্ঘাধ্যক্ষ, সাধারণ সম্পাদক মহারাজ তাঁদের স্মৃতিচারণে জানিয়েছেন মহারাজজীর কর্মদক্ষতার কথা। এঁরা সকলেই কখনও না কখনও তাঁর বৃহত্তর ত্রাণসেবাকাজে অংশ নিয়েছেন। যেকোনও কাজ হাতে নেওয়ার আগে তিনি সুচিন্তিত পরিকল্পনা করতেন। যেকোনও কাজের জন্য যোগ্যতম ব্যক্তিকেই নির্বাচন করতেন, নিয়মিত তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। কাউকে অধস্তন মনে করতেন না। সকলেই শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবাকাজে তাঁর দক্ষ ও অনলস সহকর্মী।

পূজনীয় মহারাজজীর স্থায়ী সেবাকাজের মধ্যে রয়েছে কামারপুকুর, জয়রামবাটী, বালিদেওয়ানগঞ্জ প্রভৃতি গ্রামের মানুষের উন্নতিকল্পে স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ পরিকল্পিত 'পল্লীমঙ্গল প্রকল্পে'র রূপায়ণ। এরই অঙ্গরূপে তিনি কামারপুকুরে মোবাইল ডিসপেনসারি ও প্রতি বছর বিনা খরচে চক্ষু অপারেশন শিবিরের ব্যবস্থা করেন। বেলুড় মঠে ও ব্যাঙ্গালোরের আলসুরে বৃদ্ধ সাধুদের জন্য আরোগ্যভবন নির্মাণের উদ্যোগ নেন। কাশী সেবাশ্রমে সাধু ও ভক্তদের জন্য নির্মিত বৃদ্ধাবাসও তাঁরই অবদান। স্বামী গিরিশানন্দজী স্মরণ করেছেন, অরুণাচল প্রদেশের আলং কেন্দ্রের দারিদ্র্যসংকটে পীড়িত সাধু ও ছাত্রদের জন্য সরকারি সহায়তার ব্যবস্থা করেন স্বামী আত্মস্থানন্দজী। বন্যাপ্রবণ মালদায় আশ্রমের অবস্থাও ছিল তথৈবচ। তিনি পরামর্শ দেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে এসে বন্যা পরিস্থিতি দেখানোর। এর ফলে সেবারই প্রথম সরকার থেকে ত্রাণের জন্য বেশ বড়মাপের অনুদান মেলে এবং রামকৃষ্ণ মিশনের কাজকে তাঁরা স্বীকৃতি জানান।

স্বামী সুবীরানন্দজী পূজনীয় মহারাজজীর সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কের আবেগময় স্মৃতিচারণ

করে বলেছেন, "সাধারণ মানুষের জন্য ওঁর যে আর্তি, ঠাকুরের প্রতি তাঁর যে প্রেম-ভালবাসা, ভক্তি—তা অসাধারণ। দেখবার মতন। শিখবার মতন।" আজকে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের যে ত্রাণকাজ, মহারাজজী তাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছেন বলে তিনি মনে করেন।

স্বামী বিমলাত্মানন্দ একান্ত সেবকরূপে দীর্ঘদিন মহারাজজীর সঙ্গ করেছেন। তিনি লিখেছেন, "তাঁর একক জীবনে তিনি এত বেশি কর্ম করেছিলেন, এত শ্রেষ্ঠ কর্ম করেছিলেন যেগুলি আমাদের রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে চিরস্থায়ী হয়ে রয়েছে।" রাঁচি টিবি স্যানেটোরিয়ামের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে সেটিকে তিনি একটি আধুনিক টিবি হাসপাতালে পরিণত করেন। বার্মার রেঙ্গুনের রামকৃষ্ণ মিশনের দায়িত্ব গ্রহণ করে সেখানকার হাসপাতালটিকে বার্মার সেরা হাসপাতালে পরিণত করেন। এরপর পূজনীয় মহারাজজী গুজরাটের রাজকোটে আসেন। এখানে তিনি ত্রাণ ও সেবাকাজের এক অনন্য নজির স্থাপন করেন। এসময়ে কচ্ছের ধানেতি গ্রামে রিলিফের যে-কাজ করেন তা এক সর্বকালীন দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। এই ধানেতি রিলিফের কথা অনেক সাধু-ভক্ত তাঁদের স্মৃতিচারণে উল্লেখ করেছেন। এই সময়ে ধানেতির মানুষের সঙ্গে মহারাজজীর এক মর্মস্পর্শী বোঝাপড়ার সুমধুর চিত্র ধরা পড়েছে সেই স্মৃতিচারণায়। এখানকার দুর্গত মানুষগুলির প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালবাসা ও সেবাভাব তাঁকে তাদের মনে ঈশ্বরতুল্য শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। পরবর্তী কালে সহ-সঙ্ঘাধ্যক্ষরূপে ধানেতি পরিদর্শনে গেলে তাঁকে দেখার জন্য গ্রামের মানুষ ভিড় করে আসেন। তাঁদের মধ্যে একজন বলেন, "রামচন্দ্র যেমন চৌদ্দ বছর বনবাস করে অযোধ্যায় ফিরে এসেছিলেন, আমাদের মহারাজ এসেছেন, আমরা রামচন্দ্রকে ফিরে পেয়েছি।"

পরবর্তী কালে বেলুড় মঠে ফিরে আসার পর মহারাজজী রিলিফ সেক্রেটারি হন। তাঁর সময়ে রামকৃষ্ণ মিশনের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজ এক উচ্চতর মাত্রায় পৌঁছয়। রিলিফের কাজ ব্যাপকতর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিক থেকে আসা অনুদানের অর্থানুকূল্যে সঙ্ঘের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের জন্য গঠিত রিজার্ভ ফান্ড সমৃদ্ধ হয়। বিমলাত্মানন্দজী জানাচ্ছেন, "হেডকোয়ার্টার্স অফিসে মহারাজের এটি সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান।" ত্রাণের পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পুনর্বাসনে তিনি সমধিক গুরুত্ব দিতেন। সেখানকার স্থানীয় সমস্যাটি অনুধাবন করে বিশেষজ্ঞের সহায়তায় সর্বোচ্চ সমাধানের পথ খুঁজে বার করতেন। মহারাজ স্মরণ করেছেন, বালি-দেওয়ানগঞ্জে রিলিফে গিয়ে দেখা গেল সেখানকার সমস্ত ধানজমি আঠারো ইঞ্চি পুরু বালিস্তরে ঢাকা পড়ে চাষের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। পূজনীয় আত্মস্থানন্দজী বিশেষজ্ঞদের নিয়ে এসে তাঁদের পরামর্শে ওই বালিজমিতে বাদাম চাষ করান। চাষিরা উপকৃত হয় এবং ওইভাবে চাষ করতে করতে জমি মাটি ফিরে পেলে পুনরায় তা ধানচাষের যোগ্য হয়ে ওঠে।

পূজনীয় মহারাজজী তাঁর দীর্ঘ কর্মবহুল জীবনে সমগ্র ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে নিজে উপস্থিত থেকে রিলিফের তদারকি করেছেন। যেখানে যেতে পারেননি, সেখান থেকে নিয়মিত খবর নিতেন কীভাবে ত্রাণ বিলি হচ্ছে, সাধুরা কীভাবে সেখানে থাকছেন। স্বামী শশধরানন্দজী স্মরণ করছেন, একবার ত্রাণ দিতে গিয়ে তাঁরা কয়েকজন সাধু জলে আটকে পড়লে তাঁরা ফিরে না আসা পর্যন্ত বেলুড় মঠে মহারাজকে কেউ এক কাপ চা পর্যন্ত খাওয়াতে ।৩৩।

পারেনি। তিনি বলছেন, "সত্যকৃষ্ণ মহারাজের... এই আন্তরিক ভালবাসার কথা মনে পড়লে চোখ জলে ভিজে যায়, এমন ভালবাসা কোথায় পাব?"

একদিকে ভালবাসা ও অন্যদিকে সঙ্ঘ পরিচালনার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব—এই দুই গুণের সমন্বয়ে স্বামী আত্মস্থানন্দজী সঙ্ঘের এক অনন্য সন্ন্যাসী। দুর্গত মানুষকে বাঁচাবার জন্য তাঁর আপ্রাণ চেষ্টা প্রত্যক্ষ করে শশধরানন্দজী লিখছেন, "এই যে ভালবাসা, এটাই আমাদের রিলিফের মূল কথা।" পূজনীয় মহারাজ যেসব জায়গায় নিজে রিলিফ করতে গেছেন, পরে সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাশ্রিত কেন্দ্র গড়ে উঠেছে তাঁর প্রভাবে।

পূজনীয় মহারাজ সমাজের সকল স্তরের মানুষকে অনায়াসে প্রভাবিত করতে পারতেন। স্বামী বিশ্বাত্মানন্দজীর কথায়, "He was an inborn leader"। যেখানে যেতেন সেখানকার ভাষা শিখে নিতেন। ফলে সেখানকার বিশিষ্ট জনেদের সঙ্গে ভাবের আদানপ্রদান সহজ হত। কীভাবে শিল্পপতিদের থেকে অর্থসংগ্রহ করে সমাজের বৃহত্তর সেবাকাজে লাগাতে হয় তা তিনি জানতেন। স্বামী বিমোক্ষানন্দজী লিখছেন, "সবক্ষেত্রেই তাঁর ব্যক্তিত্বের যাদু কাজ করত ইতিবাচকভাবে।" বিড়লা গোষ্ঠী, পিয়ারলেস গ্রুপ, অরবিন্দ টেক্সটাইল, এক্সেল ইন্ডাস্ট্রিজ, বাজাজ কোম্পানি প্রভৃতি নামিদামি সংস্থা মহারাজজীর অমোঘ আকর্ষণে সঙ্ঘের কাজে নানাভাবে সেবা দিতে এগিয়ে এসেছেন। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধি তাঁর অনুরোধে বালি-দেওয়ানগঞ্জের গণ্ডগ্রামে এসে বিদ্যালয় উদ্বোধন করেছেন। কলোনি উদ্বোধনের জন্য মহারাজজী নিয়ে এসেছেন মুখ্যমন্ত্রীকে। এছাড়া সর্বত্র বিভিন্ন সরকারি সচিবের সঙ্গেও তাঁর সৌহার্দ্যের সম্পর্ক ছিল। তাঁদের সাহায্যে স্বামীজীর পৈতৃক ভিটা, গুজরাতে স্বামীজীর স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলি অধিগ্রহণ করেন তিনি।

রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ এডুকেশনাল অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সম্পাদক স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দজী স্মরণ করেছেন, পূজনীয় আত্মস্থানন্দজীর চরিত্রের একদিকে ছিল দৃপ্ত পৌরুষ, অন্যদিকে আবেগময় ভক্তি। "তাঁর আচরণে কঠোরতা ও কোমলতার দ্রুত পালাবদল ঘটত।" প্রয়োজনে কঠোর শাসন করতেন, 'তাঁর রুদ্রমূর্তি অন্তরাত্মা কাঁপিয়ে দিত', আবার পরক্ষণেই হয়ে উঠতেন 'কোমল করুণার প্রতিমূর্তি'। স্বামী সিদ্ধেশানন্দজী জানাচ্ছেন, সত্যকৃষ্ণ মহারাজের সান্নিধ্যে তাঁরা মাতৃসান্নিধ্যের নিরাপত্তা অনুভব করতেন। তাঁর মধ্য দিয়ে যেন শ্রীশ্রীঠাকুরের ভালবাসা প্রতিফলিত হত।

স্বামী ঋতানন্দজী স্মৃতিচারণ করেছেন, পূজনীয় আত্মস্থানন্দজী ছিলেন রাজকীয় চেহারার অধিকারী, একেবারে পরিপাটি ও শৃঙ্খলাপরায়ণ। নিজের সমস্ত দায়িত্ব সামলিয়েও মঠের প্রবীণ সাধুদের, প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট মহারাজদের এবং আরোগ্য ভবনের অসুস্থ ও অবসর জীবনযাপনকারী সাধুদের দেখাশোনার দায়িত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিলেন। পূজ্যপাদ অভয়ানন্দজীর কাছে প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতির মতো কোনও উচ্চস্তরের ভি আই পি অতিথি এলে তাঁদের অভ্যর্থনা, আপ্যায়ন, মঠ ঘুরিয়ে দেখানো ও বিদায় সম্ভাষণ পর্যন্ত সমস্ত দায়িত্ব ছিল তাঁর।

প্রব্রাজিকা ভবপ্রাণামাতাজীর কাছে পূজনীয় মহারাজ ছিলেন জীবনের ধ্রুবতারা। রেঙ্গুন আশ্রমে তাঁর স্নেহচ্ছায়ালালিত শৈশব, বড় হয়ে কলকাতায় তাঁরই নির্দেশনায় শিক্ষালাভ করে ত্যাগ

ও বৈরাগ্যের পথ অবলম্বন। চয়ন করেছেন তাঁকে লেখা মহারাজজীর চিঠি থেকে অমূল্য কিছু অংশ। প্রব্রাজিকা বীতরাগপ্রাণামাতাজী স্মরণ করেছেন তাঁর জীবনের পাথেয়স্বরূপ মহারাজজীর অমোঘ বাণী, "শ্রীশ্রীঠাকুর, মাকে দিয়েই জীবনের শূন্যতা পূরণ হয়। অন্য কোনও পথ নেই।"

গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে রয়েছে মহারাজজীর সান্নিধ্যে সমৃদ্ধ ভক্তদের স্মৃতিচারণ। এঁরা সকলেই তাঁর 'বজ্রাদপি কঠোরাণি, মৃদুণি কুসুমাদপি' হৃদয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। সুমন সেনগুপ্ত স্মরণ করেছেন, স্বামীজীর রচনাবলী দেখিয়ে মহারাজজী বলতেন, সব মুশকিল আসান তো হাতের কাছেই আছে। যুবসমাজ যে স্বামীজী সম্পর্কে উদাসীন, একথা মহারাজজী বিশ্বাস করতেন না। বরং স্বামীজীর আদর্শ গ্রহণে তারাই অগ্রণী। স্বামীজীর আহ্বানে যাঁদের উদ্দীপনা হয়েছে, তাঁরা যদি ঠিকমতো চলেন, তাহলে নবীন প্রজন্ম তাঁদের হাত ঠিকই ধরে নেবে। পূর্বা সেনগুপ্ত লিখছেন, ''লোককল্যাণ, লোকজাগরণ, লোকপ্রেম, লোকপ্রাণতা দিয়ে গড়া ছিল এই মহান মানুষটির মন।" মধুমিতা ঘোষ উল্লেখ করেছেন স্বামী গোপেশানন্দজীর কাছ থেকে শোনা একটি ঘটনার কথা। ছাত্রজীবনে স্বামীজীর 'কোনও কাজই ছোট নয়'—কথাটিকে বাস্তবে রূপায়িত করতে সত্যকৃষ্ণ গিয়েছিলেন দমদম রেলস্টেশনে কুলির কাজ করতে। যদিও তাঁর চেহারার আভিজাত্য দেখে কেউ তাঁকে মাল দিতে চাননি। অভিরূপ দত্ত পূজনীয় মহারাজজীর সঙ্গে তাঁর মধুর সম্পর্কের রসায়ন তুলে ধরেছেন। অতি শৈশব থেকে শুরু করে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত এই তরুণের কাছে তাঁর 'দাদু মহারাজ'-এর গ্রহণযোগ্যতা একইরকম। পিয়ারলেস গ্রুপের কর্ণধার সুনীলকান্তি রায় পূজনীয় মহারাজের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ সাঁইত্রিশ বছরের প্রত্যক্ষ পরিচয়ের অভিজ্ঞতা জানিয়েছেন। এই আন্তরিকতা এতদূর ছিল যে, একদিন মহারাজজী বলেন, "ওর টাকা কি ওর টাকা নাকি? ওর টাকা তো আমাদের টাকা।" বাস্তবিকই দাতা ও গ্রহীতার এই সম্পর্কের মাধুর্যে অনেক আর্তজনের জীবন মধুময় হয়ে উঠেছে। সাধন মোহন মণ্ডল তাঁর সম্বন্ধে বলছেন, 'সমুদ্রের তরঙ্গের মতো তেজস্বিতা' এবং 'সহমর্মিতার বাদশা'। প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত, প্রাক্তন রাজ্যপাল ও বিচারপতি শ্যামলকুমার সেন, শান্তি ভট্টাচার্য (মহারাজজীর বোন)—এঁরাও দুর্লভ সঙ্গসুখের স্মৃতি ভাগ করে নিয়েছেন। মহারাজজীর ভ্রাতুষ্পুত্র রাজকৃষ্ণ ভট্টাচার্য তাঁদের নিখুঁত বংশ পরিচয় সমৃদ্ধ একটি নিবন্ধ রচনা করে দিয়েছেন। সংগীতশিল্পী যূথিকা রায় তাঁর স্মৃতিচারণে পূজনীয় মহারাজজীর প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন।

গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে সংকলিত হয়েছে পূজনীয় মহারাজজীর মননের আলোকে দিব্যত্রয়ীর কথা। তিনি আলোচনা করেছেন, যুগে যুগে আবির্ভূত অবতারপুরুষগণ ধর্মকে স্থান, কাল ও প্রথানুযায়ী প্রবর্তন করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে বলছেন, "তিনি হিন্দু কিন্তু একটু অন্যরকমের। এটাই নতুনত্ব।" শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্বৈতবাদ শঙ্কর মতানুসারী অদ্বৈতবাদকে কীভাবে অতিক্রম করে গেছে, তা তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। শ্রীশ্রীমা সম্পর্কে লিখছেন, শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীর জীবনেই ইতিহাসে প্রথমবার বিশ্বমাতৃত্বের ভাব প্রকাশিত হয়েছে। স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীমাকে তাঁর সর্বগ্রাসী, সর্বজনীন এবং সর্বব্যাপী মাতৃত্বে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

অন্য আর একটি প্রবন্ধে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে বলছেন অভূতপূর্ব, অশ্রুতপূর্ব, অদৃষ্টপূর্ব ।৩৫।

আধ্যাত্মিক সম্রাট। কথামৃত সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ন : কথামৃত "সর্বস্তরের সর্বকালের সর্বদেশের মানুষের কাছে ভগবানকে ধরা ছোঁয়ার মধ্যে এনে দেয়।" ঠাকুর-মা না এলে এযুগের মানুষ মানত না যে কাম-কাঞ্চন জয় করা সম্ভব। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের মানবতাবাদ আলোচনা করতে গিয়ে দেখিয়েছেন, তা কখনই অদ্বৈতভাবের বিরোধী নয়। বরং অদ্বৈতভাবে নিত্য প্রতিষ্ঠিত "শ্রীরামকৃষ্ণের মানবতা এককথায় মানুষের অন্তর্নিহিত চিরন্তন চৈতন্যশক্তির স্বীকৃতি।" দেবমানব শ্রীরামকৃষ্ণ একজন সাধারণ আটপৌরে মানুষ। কিন্তু চন্দ্র হালদারের দ্বারা মর্মান্তিক নিগৃহীত হয়েও যখন তার জীবনরক্ষায় তিনি তৎপর, তখনই ধরা পড়ে 'তিনি জীবন্ত ঈশ্বর'। অন্য এক প্রবন্ধে মহারাজজী আলোচনা করেছেন উপনিষদের যুগ থেকেই সনাতন ধর্মের ঐতিহ্য হল সমন্বয়ভাব, যা নানা জটিল কুটিল পথ অতিক্রম করতে করতে গোঁড়ামি, সংকীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতায় পর্যবসিত হয়েছিল। সমন্বয়াচার্য শ্রীরামকৃষ্ণ শোনালেন 'যত মত তত পথ'। বিবিধ জাতি ও ভাবের মানুষকে একসূত্রে গ্রথিত করে জগতকে তিনি উপহার দিয়েছেন 'অতি সুসজ্জিত মনোরম মানবরত্নহার'।

যুবসমাজে স্বামীজীর প্রভাব আলোচনা করতে গিয়ে মহারাজজী বলছেন, ওরাই পারবে স্বামীজীর আদর্শের ধারক ও বাহক হয়ে উঠতে। ওরাই আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে, রিলিফ করতে দৌড়ে যায়। সমাজে যারা প্রবীণ, অভিভাবক, শিক্ষক—তাঁরা যদি স্বামীজীর উচ্চ ভাবকে আত্মস্থ করে যুবসমাজকে সেই ভাব দিতে পারেন, তাহলে সহজেই সেই আদর্শের প্রতি তাদের অনুরাগ আসবে। স্বামীজীর মানুষ গড়ার আহ্বান, নারীজাতির উন্নতি, অনুকরণপ্রিয়তা ত্যাগের সাবধানবাণী তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। সর্বোপরি "ধর্মের ভিত্তিতেই আমাদের জাতীয় সংহতি, একতা সম্ভব।" (পৃঃ ১২৮) বাংলা সাহিত্যে স্বামীজীর অবদান সম্পর্কে পূজনীয় মহারাজ কয়েকটি প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, 'উদ্বোধন' বাংলা সাহিত্যের এক দিঙনির্দেশক। প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্র' প্রকাশের আগে থেকেই বাংলা গদ্যের যথার্থ রূপকল্পনা স্বামীজী করেছিলেন। উচ্চদরের হাস্যরস পরিবেশনেও তিনি পথিকৃৎ। তাঁর শিক্ষাচিন্তা আমাদের পাথেয়।

দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সংকলিত হয়েছে প্রাচীন সাধুদের সম্পর্কে মহারাজজীর স্মৃতিমন্থন। জীবনের প্রভাতে পেয়েছিলেন গদাধরানন্দজীকে। মহারাজ বলছেন, "ঠাকুরের ভাব ওঁর কাছ থেকে পেলুম।" শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের কাছে তাঁর মন্ত্রদীক্ষা। দীর্ঘদিন স্বামী বিরজানন্দজীর সেবা করেছেন। তাঁর মহাসমাধির পর তাঁর সম্বন্ধে ইংরেজিতে মহারাজজীর দুটি প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ 'বরানগর মঠে কালীকৃষ্ণ' ও 'কালীকৃষ্ণের সম্মুখযাত্রা' নামে সংকলিত হয়েছে।

'প্রাচীন সন্ন্যাসীদের সান্নিধ্যে' অধ্যাত্মজীবন গঠনের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে তাঁর ভাষণে। স্বামী নির্বেদানন্দজী, অচলানন্দজী তাঁকে সাধু হওয়ার অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। তিনি বলছেন, "আধ্যাত্মিকতা, চারিত্রিক উৎকর্ষতা, এ গুণগুলির প্রভাব খুবই শক্তিশালী এবং ছোঁয়াচেও বটে।" (পৃঃ ২৭৪) জগদানন্দজীর কাছে শাস্ত্রপাঠ, রাঁচিতে শান্তানন্দজীর সেবার সুযোগ, মায়াবতীতে পবিত্রানন্দজীর আনুকূল্যে সাধুজীবনের ঘোরতর দুর্বিপাক এক মিথ্যা অপবাদ থেকে পরিত্রাণ লাভ,

বেদান্ত মঠে স্বামী অভেদানন্দজীকে দর্শনের কথা স্মরণ করেছেন মহারাজজী। স্বামী প্রেমেশানন্দজী, বিশুদ্ধানন্দজী, মাধবানন্দজী, নির্বাণানন্দজী, বীরেশ্বরানন্দজী, গম্ভীরানন্দজী, ভূতেশানন্দজী, অভয়ানন্দজী, রঙ্গনাথানন্দজী, লোকেশ্বরানন্দজীর আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ও সান্নিধ্যের স্মৃতিচারণ গ্রন্থকে সমৃদ্ধ করেছে। মহারাজজী বলছেন, "দিব্যজীবনের পথিকৃৎদের সংস্পর্শে যাঁরা আসেন, তাঁদের জীবনও পবিত্র হয়ে ওঠে, জেগে ওঠে তাঁদের আধ্যাত্মিকতা।" (পৃঃ ২৯৪)

তৃতীয় অধ্যায়ে স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজের বক্তৃতা, আধ্যাত্মিক বিষয়ে আলোচনা ও সাক্ষাৎকারগুলি রয়েছে। তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন ঠাকুর-মা-স্বামীজীর জীবন ও বাণীর বাস্তব রূপায়ণের দায়িত্ব সন্ন্যাসীদের পাশাপাশি গৃহী ভক্তদেরও। বলছেন, নরনারায়ণের সেবাই আধ্যাত্মিকতা লাভের সোপান। চতুর্থ অধ্যায়ে রয়েছে পূজনীয় মহারাজজীর দিনলিপি। মায়াবতীতে অবস্থানকালে ২০ জুন ১৯৪২ শিল্পী নন্দলাল বসু যেসব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন, সেগুলি নিয়ে শিল্পের দর্শন ও শিল্পীর বিশ্বাস বিষয়ে একটি নিবন্ধ রয়েছে ওইদিনের দিনলিপিতে। ১৯৩৮-এর ১ জানুয়ারি থেকে ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত দিনলিপিতে ছাত্রজীবনে বেলুড় মঠ ও শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি তাঁর আকর্ষণ, দীক্ষাগ্রহণ সহ সাধুসঙ্গের কথা যেমন লিখেছেন, তেমনি জপধ্যানের দ্বারা মনের চঞ্চলতা থেকে উত্তরণের কথাও লিপিবদ্ধ করেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রত্যক্ষ দর্শন লাভের কথা রয়েছে ২৯ জুলাই ১৯৯৩-এর দিনলিপিতে। কত অল্প সময়ের ব্যবধানে এই মহান কর্মযোগী ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে বেড়িয়েছেন, তার সাক্ষ্য এই দিনলিপি।

পঞ্চম অধ্যায়টি 'বিবিধ : প্রবন্ধ, ভাষণ, স্তোত্র এবং প্রশ্নোত্তর পর্বে স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ।' এতে রয়েছে সঙ্ঘের ত্রাণসেবাকাজের আদর্শ, সুসংবদ্ধতা, প্রকারভেদ ও সেবার পর্যায়ক্রম নিয়ে 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর ইংরেজি নিবন্ধের স্বামী সুপর্ণানন্দজী কৃত বঙ্গানুবাদ, স্বামীজীর সার্ধশতবর্ষে দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রশ্নোত্তর ও সিদ্ধান্ত 'নিঃস্বার্থপরতাই হল ভগবান'। যুব সম্প্রদায়ের সঙ্গে প্রশ্নোত্তরপর্বে অনেকগুলি প্রাসঙ্গিক বিষয়ের আলোচনা রয়েছে, যার অন্যতম, একজন বিবেকানন্দ-অনুরাগীর পক্ষে বর্তমান যুগে আর্থ-সামাজিক বিষয়ের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত রাজনীতিকে বর্জন করে চলতে পারা সম্ভব কী না। ষষ্ঠ অধ্যায়ে সংকলিত হয়েছে তাঁর কিছু চিঠি ও বাণী। পরিশিষ্টে রয়েছে 'হ্যালো ভি. আই. পি.' নামে স্টার আনন্দকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকার, স্বামীজীর সার্ধশতবর্ষে 'ভ্যালু ওরিয়েন্টেশন'-এর বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রশ্নোত্তরের বঙ্গানুবাদ, 'আধ্যাত্মিকতাই ভারতের আত্মা', দেবরাজ মিত্র কৃত মহারাজজীর জীবনপঞ্জী এবং একটি বংশ তালিকা। এগুলি গ্রন্থের তথ্যভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে।

দুটি খণ্ডে স্মরণিকা গ্রন্থটির কলেবর বৃদ্ধি ঘটলেও, পূজনীয় মহারাজজীর যাপিত অনন্য জীবন ও তাঁর উপদেশ আরও বহু প্রাণকে ঠাকুর-মা-স্বামীজীর আদর্শে জীবন গঠনে অনুপ্রাণিত করবে। দুটি খণ্ডেই রয়েছে অজস্র দুর্লভ ফটো। বিশিষ্ট গবেষক পূর্বা সেনগুপ্ত অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে দুটি খণ্ডের সম্পাদনা করেছেন। তাঁকে অনুসরণ করে বলতে পারি, এই বিশাল গ্রন্থখানি যেন গঙ্গার বিপুল জলরাশি। এর পাঠ ও অনুধ্যান নিঃসন্দেহে পাঠককে গঙ্গাস্নানের পরিতৃপ্তি ও পবিত্রতা এনে দেবে। নি

১৩৭১